ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 576-583
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.045

বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক

সুমনা বিশ্বাস, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.01.2025; Accepted: 29.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bijan Bhattacharya is one of the most significant figure in the history of Bengali drama literature. It can be said that he started his theater career in the 1940. There was a group of anti-fascism writers who started the independent theatrical movement on going beyond the reach of commercial theatre. Their cultural branch was the Indian People's Theatre Association. The most influential and unforgettable event in the world of Bengali theater literature is the 'Gananatto movement'. Bijan Bhattacharya was one of the proverbial personality of this theatrical movement. However, this movement of the 1940s was not born in one day. The play 'Nabanna' was born out of this unstable political context. Most of the plays of that time were mainly stories of kings and queens, stories of the people of the upper class society, the stories about various mythology and history. No other writer portrayed the life of middle class people as truly as Bijan Bhattacharya portrayed their lives in his play 'Nabanna'. The backdrop of this play was the turmoil of World War II, August movements of 1942, the Bengal famine and natural disasters. In this play Bijan Bhattacharya depicted those people who could barely afford food at that time. Throughout this play, he showed the pathetic situations of the farmers. Famine, depression, brutal British rules, the plight of people of Aminpur caused by blackmarketing and at the end, the eventual protest of the people which gave them the freedom from all these misery have been perfectly illustrated in the play. At the end of the famine, all of them were united and celebrated the New Rice Festival. It seemed the joy was sounding everywhere at the end of the play 'Nabanna'.

Keywords: গণনাট্য আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মন্বন্তর, কালোবাজারি, নারীর আত্মসম্মান, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন বিজন ভট্টাচার্য। বলা যায় তিনি নাট্যজীবনে পদার্পণ করেন ১৯৪০ এর দশকে। কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখকগোষ্ঠী ছিলেন যারা স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধরার বাইরে গিয়ে। এদেরই সাংস্কৃতিক শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বাংলা নাট্য সাহিত্যের জগতে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ও অবিস্মরণীয়

ঘটনা হলো ‘গণনাট্য আন্দোলন’। আর এই নাট্য আন্দোলনের একজন প্রবাদপ্রতিম মানুষ ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। তবে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের এই আন্দোলন এক দিনে গড়ে ওঠেনি। এই অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে ‘নবান্ন’ নাটকের জন্ম হয়। তৎকালীন সময়ে বেশিরভাগ নাটকের কাহিনী ছিল মূলত রাজা রানীদের কাহিনী, উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের কাহিনী, পুরান ও ইতিহাসের নানান কথা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন চিত্র সেইভাবে ফুটে ওঠেনি কোন নাট্যকারের হাতেই নবান্ন নাটকের মতো। এই নাটকটির পটভূমিকা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণ খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে যেদিন কোন অন্ন ছিল না সেই নিরন্ন মানুষের মুখের দিকে চেয়ে বিজন ভট্টাচার্য এই নবান্ন নাটক লিখেছিলেন। নাটকের মধ্যে দিয়ে কৃষক সমাজের করুন জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, বিদেশি শাসনের অত্যাচার, স্বার্থান্বেষী মানুষের কালোবাজারি জনিত আমিনপুরের কৃষকদের দুরবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্দশা থেকে মুক্তির চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে এই নাটকে এবং দুর্ভিক্ষ পীড়নের শেষে নতুন ধানের উৎসবে একত্রিত হয়ে নবজীবন লাভের আনন্দধ্বনিত হয়েছে নবান্ন নাটকে।

ভারতবর্ষে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূচনা ঘটে তখন ধীরে ধীরে জমিদার শ্রেণীর অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগঞ্জে গড়ে ওঠা সৌখিন নাট্যশালাগুলি তার পুরনো গৌরব হারাতে থাকে। অপরদিকে নাটক ও নাট্য মঞ্চের ওপরে চলচ্চিত্রের প্রভাব বাড়তে থাকায় বাংলার মঞ্চ পরিবেশ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে নাট্য উৎসাহী একদল যুবক চল্লিশ এর দশক থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন ভাবাবেশ নিয়ে আসেন। এই ভাবাবেশ ক্রমে আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং সেটিই নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে তার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাদের ইচ্ছা, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করা। এই গণনাট্য আন্দোলনেরই ফল হিসেবে নবনাট্য ও বর্তমান যুগের গ্রুপ থিয়েটারের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। নবান্ন নাটকই প্রথম, যেটির মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল যে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়েও সাধারণ মানুষের জন্য নাটক রচনা করা যায়। এর পাশাপাশি বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন, মরাচাঁদ, কলঙ্ক, ছায়াপথ, অবরোধ, প্রভৃতি নাটকে গণসংস্কৃতির বোধকে তিনি আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়-

> “গতানুগতিক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের আওতায় থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টা এদেশের গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজ মানুষের এক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে।”[১]

এই আন্দোলন শুধুমাত্র নাট্যসাহিত্যের উপরই প্রভাব বিস্তার করেনি পাশাপাশি বাংলার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক দিকেরও বিকাশ ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মন্দিরারাই লিখেছেন-

> “গণনাট্য আন্দোলন শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল। মঞ্চ পরিবেশের গতানুগতিকতা যখন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সেই মুমূর্ষু নাট্যরঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিল এই আন্দোলন। গণনাট্যের অর্থ শুধু জনতা বা গনের নাটক নয় সেই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক তথা নাট্য আন্দোলনও বটে।”[২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, মান্বন্তর, বন্যা, ঝড় অন্যদিকে কালোবাজারি ইত্যাদি ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে জনগণের সামনে এগিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। সাধারণ মানুষের এই বিপদের কথা সকলকে জানানো, অন্যান্য জায়গার মানুষের কাছে বার্তা পাঠানো এইভাবে নানান কাজের মাধ্যমে এই সংঘের ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। সারা দেশবাসীর মনোবেদনা ও প্রতিরোধের ছবি এরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে থাকে।

> "শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অত্যাচারী মুখোশ খুলে ধরা, মুনাফাখোর, মজুতদারের বদমায়েশি প্রকাশ করা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়ের পরিনাম এবং এর সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রতিরোধ ও বাঁচার লড়াইকে সামনে এনে, মানুষের মুক্তি ও শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের উপস্থিতি সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করা - এই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সকল সাংস্কৃতিক কাজের অনুপ্রেরণা।"[৩]

চল্লিশের দশকের গোড়ায় গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের নামটি সমার্থক হয়ে উঠেছিল। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ সাধারণ মানুষ যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাণপণ চেষ্টা করছিল ঠিক তখনই ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সারা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাংলার সমস্ত মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। দু-মুঠো অন্নের জন্য মানুষের হাহাকার, অভাব, অনাহার, মানুষের করুন অবস্থার কথা উঠে এসেছে এই নবান্ন নাটকে। এই নাটকে একদিকে যেমন উঠে এসেছে স্বার্থপর ও প্রতারক শ্রেণীর মানুষের চক্রান্তের কথা, অন্যদিকে তেমনি উঠে এসেছে নির্যাতিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা। সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। তাই এ প্রসঙ্গে বলা যায়-

> "নবান্ন নাটকে প্রথম থেকে দুর্গতি ও দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে। নাটক শেষও হয়েছে প্রতিরোধের মাধ্যমেই। নবান্ন নাটক তাই শুধু দুর্গতির নাটক নয় প্রতিরোধেরও নাটক।"[৪]

চল্লিশের দশকের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ঘনঘন পট পরিবর্তন হতে থাকে। শাসক সমাজে নির্মম অত্যাচার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, মন্বন্তরের অভিঘাত, ফ্যাসিবাদের খবরদারি, পৃথিবীর জুড়ে তীব্র হাহাকারের রোল ওঠে, বেঁচে থাকার তাগিদে একটা ছেড়া রুটি নিয়ে মানুষ ও কুকুরের মধ্যে লড়াই, ভূমিহীন কৃষকদের দুর্দশা, মহাজনের অকথ্য অত্যাচার ইত্যাদি বাঙালি সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। এই অরাজকর পরিস্থিতিতেই বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> "এই আন্দোলনকে আকস্মিক উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণ-আন্দোলন বলিয়া মনে করা হইলে ভুল করা হইবে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহার পশ্চাতেও জাতির একটি সুদীর্ঘ তপস্যা অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।"[৫]

বিজন ভট্টাচার্য যখন স্কুলে পড়তেন অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা থেকেই তার জীবনে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪২ সালের পর থেকে শুরু হয় তাঁর নাট্যজীবনের পথ চলা। তাঁর নাটকগুলি ছিল বাস্তবতার প্রত্যক্ষ দলিল। গ্রামগঞ্জের অনুন্নত, অশিক্ষিত, নামপরিচয়হীন হতদরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষগুলি তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রের আসন লাভ করতেন। নবান্ন নাটকটিকে গণনাট্য আন্দোলনের মাইলস্টোন বলা চলে।

নাটকটি প্রথম ১৯৪৪ সালে 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে নবান্ন নাটকটি রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ধারা, চেতনা প্রবাহের ভাবধারা, পরাবাস্তবতাবাদ, অ্যাবসার্ড ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, আজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র প্রমুখ কৃতিমান নাট্যকাররা এই গণনাট্য আন্দোলনের ধারাকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন তাদের নাট্যসৃজন ও অভিনয়ের দ্বারা।

গণনাট্য সংঘ বাংলার রঙ্গমঞ্চে নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করে। অন্যান্য সব আন্দোলনের মতো নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল চাঞ্চল্যের, উদ্দীপনার ও উত্তেজনার। বাংলাদেশে তথা ভারতে বহু যুগ আগে থেকে গ্রামের মানুষজনের আনন্দ উপভোগের উপকরণ ছিল লোকনাট্য। গণনাট্য নামকরণটিতে লোকনাট্য প্রভাবের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য, এছাড়া ভাব-সদৃশ্য যথেষ্ট রয়েছে। গণনাট্যের ভিত্তি হলেও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আঘাত ও সংঘাতের ইতিকথা। ধীরে ধীরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মানুষের মুষ্টিমদ্ধ হাত আকাশ স্পর্শ করে। অসম অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণ চায় সঙ্ঘবদ্ধ হতে। ভীরুপাতাকে উপেক্ষা করে মানুষের পৈশাচিক লোভ ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একের পর এক কাহিনী চিত্রিত হয়েছে গণনাট্যে। এই দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কালোবাজারি সবকিছুর বিরুদ্ধে গিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ তাদের জয় ছিনিয়ে নিতে সকলে মিলে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। গ্রাম বাংলার পুরুষদের সাথে সকল নারীরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সামিল হয়েছিল। পুরুষদের সঙ্গে থেকে তাদের শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে সমাজকে রক্ষা করতে তারা সচেষ্ট হয়েছিল। তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত পঞ্চাননী, রাধিকা, বিনোদিনীর মতো গ্রাম বাংলার সহস্র সংগ্রামী নারীরা। এই দুর্ভিক্ষ, অনাহার, সাধারণ মানুষের জীবনকে কতটা দুর্বিষহ করে তুলেছিল তা উঠে এসেছে নাটকের প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। রাধিকার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই-

> "দেখছো কি, কিছু কি থাকলো! হুঃ উজোর হয়ে গেল গাঁ । উত্তর পাড়ায় তো সেই একেবারে, থাক আর নাম করবো না একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে একবিন্দু জল যে গালে দেবে তা পর্যন্ত কেউ নেই। কি যে সব হবে! এমন আকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনদিন।"[৬]

মৃত্যুর ভয়াবহতা সাধারণ মানুষকে শিহরিত করে তোলে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে অনাহারে মৃত্যুই ছিল সাধারণ মানুষের অনিবার্য পরিণতি আর সেই চরম পরিণতির স্বীকার হতে হয়েছিল অমিনপুরের সকল গ্রামবাসীদের।

১৯৪২ এর আগস্ট মাসে ভারতছাড়ো আন্দোলন সারাদেশ জুড়ে ভয়ংকর রূপে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। দেশ জুড়ে আন্দোলন এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্মম দমন পীড়ন হিংস্র রূপ নেয়। এই আন্দোলনে প্রধান সমাদ্দারও তার দুই পুত্রকে হারিয়েছে। বিয়াল্লিশ এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে পুলিশের অত্যাচারে গ্রামবাসী ভীত হয়ে ওঠে।সন্তান হারানোর ব্যথায় এবং তিন গোলা ধান নষ্ট হওয়ার বেদনায় প্রধান রুখে দাঁড়াতে চায়। গ্রামবাসীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নেপথ্যে শাসক শ্রেণীর অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে। মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে বলে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী সবাইকে এর প্রতিকার করতে বলে-

"কুঞ্জ- (ক্ষোভের সুরে) ইজ্জত! ইজ্জত দেখছে! জীবনটাই সেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়ে মানুষের ইজ্জত! কিন্তু কিন্তু।

প্রধান- ওই হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু! ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবারে (মরিয়া ভাবে) কিন্তু টারে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে...।"[৭]

আগস্ট আন্দোলন এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের আকালের অশুভ ছায়া দেশ থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে পরিবারের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করেছে। যার ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে অনাহার, অত্যাচার, ক্ষুধা, মানুষের পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল প্রভৃতি। বছরের শেষ সম্বল ধানটুকু রোদে শুকোতে দিয়ে দৃশ্যের সূচনা।

"রাধিকা- (উঠোনে ধান ছড়িয়ে পা দিয়ে নাড়তে নাড়তে) নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ - কেন মাচার ওপরে সেই যে কালো জালার ভিতরি যে পুরনো আউশ কতগুলো ছিল?

রাধিকা- (মুখ ঝামটা দিয়ে) হ্যাঁ বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্য সেই ধান।"[৮]

খাদ্যাভাবের করুন চিত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায় আলোচ্য উক্তির মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও আমরা প্রধানের মুখে শুনি-

"প্রধান- হুঁ, সে কথার আর কী বলবো বল! এই তো দ্যাখো না, সকালবেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত চেঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দুখানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এসেছে কুঞ্জ, পাঁচজনের সংসার, বলতো কার মুখে দিই এই চাল কটা।"[৯]

তীব্র অভাব, অন্নসংকট, ক্ষুধার্ত মাখনের বায়না, খেতে চাওয়া, কুঞ্জ ও প্রধানের কিছু করতে না পারার অসহায়তা এই সঙ্কটাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নাটকটি এগিয়ে গেছে।

নবান্ন নাটকটি গণনাট্য আন্দোলনে নতুন জোয়ার এনেছিল। নবান্ন হলো গ্রামবাংলা নতুন অন্নের উৎসব। সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে পুরুষের সাথে নারীরা ও সামিল হয়েছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। বাংলার এই দুর্ভিক্ষের চরম মুহূর্তে সাহসী নারীর প্রতিমূর্তি হিসেবে আমরা দেখতে পাই প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীকে। দারিদ্রতা নিত্যসঙ্গী হলেও পঞ্চাননীর মতো নারীদের কাছে আত্মসম্মানটাও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। পঞ্চাননীর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই-

"প্রধান - সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোন কথা কয়ো না। কোন কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে...

পঞ্চননী - তার আর বলবে কি। আজ তিনদিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোন কথা না। কিন্তু শরম! লজ্জা! তোমাদের দেশের মেয়ে মানুষের অঙ্গের ভুষণ! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর! আর তারপর সব চাইতে বড় কথা ইজ্জত! মেয়ে মানুষের ইজ্জত! কী কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!"[১০]

অভাব অনাহারের মধ্যেও পঞ্চাননী আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নিজে সামিল হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের উৎসাহ দিয়েছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। নাটকে পঞ্চাননীর কণ্ঠে শোনা যায়-

"পঞ্চাননী - আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পিছু হটছিস। পেছসনে, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।"[১১]

পঞ্চাননী প্রতিবাদী তার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র রাধিকা এবং বিনোদিনী তারাও সমান প্রতিবাদী। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে শাসক সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে তারা পিছু হটেনি। তারা অভাব, অনাহার, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থেকেও আত্মসম্মানের লড়াইয়ে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে আমিনপুরের কৃষক সমাজ যখন অতিষ্ঠ এছাড়াও প্রতিকারের আন্দোলনে যখন প্রধানের দুই ছেলে নিহত এবং গ্রামের নারীদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি সেই সেই সময়ে পঞ্চাননী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। আমরা সম্মিলিত সেই প্রতিরোধের ছবি দেখতে পাই এই 'নবান্ন' নাটকটিতে।

এরপর আমিনপুরে দুর্ভিক্ষ মহামারিতে কৃষক সমাজ দিশাহারা হয়ে যায়, সাথে ভয়াবহ বন্যা, সাইক্লোনের ফলে ঘরবাড়ি, ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। আস্তে আস্তে মহামড়কের ফলে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। এত কিছুর পরেও হারু দত্তের মতো স্বার্থপর সর্বগ্রাসী মানুষের দৃষ্টি পরে সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষের ওপর। তিনি মুখে মিষ্টি কথা বলে, আর পাছে সাধারণ মানুষের শেষ সম্বল জমিটুকু কেড়ে নিতে আসে। তার কাছে কুঞ্জ এবং প্রধান জমি বিক্রি করতে চায় না। কুঞ্জ বলে ওঠে-

"টাকার লোবানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।"[১২]

রাষ্ট্রের অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়ক ও মন্বন্তরে বিপর্যস্ত মানুষের নিদারুণ অবস্থা ফুটে উঠেছে এবং তারই সহযোগী হয়ে উঠেছে হারু দত্ত। আকালের সুযোগ নিয়ে হারু দত্ত গোপনে মেয়ে পাচার এবং নারী ব্যবসা চালাতে থাকে, এক গোষ্ঠীর মানুষের বিপদের দিনে আর এক গোষ্ঠীর মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে যে মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার এই ছবি এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মহাজনের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে ও অত্যাচারের স্বীকার হয়ে গ্রামবাসীদের নিঃস্ব হয়ে চলে যেতে হয় নগর কলকাতায়। সেখানে গিয়ে তারা পেট ভরে দুটো খেতেও পায় না। বেঁচে থাকার তাগিদে ভাত তো দূরের কথা সামান্য ফ্যানও তাদের কপালে জোটে না। মানুষে কুকুরে লড়াই করে ডাস্টবিন থেকে খাবার পেতেও তারা অসমর্থ হয়, অথচ একই শহরের সমাজের বড় বাবুরা স্বার্থপর লোকেদের নিমন্ত্রণ করে খাবার খাওয়াচ্ছে আর ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর মানুষের আর্তনাদ সেই নিষ্ঠুর মানুষদের কানে পৌঁছাচ্ছে না। প্রধান সমাদ্দার ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় উঁচু তলার মানুষগুলোর প্রতি চিৎকার করে বলতে থাকে-

"আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে! তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু - কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু।"[১৩]

ধীরে ধীরে এই সমস্ত কালোবাজারির প্রকোপ, নির্যাতন, মহামারীর যন্ত্রনা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে মানুষের উত্তরন ঘটে, আমিনপুরের মানুষেরা পুনরায় গ্রামে ফিরে এসে জোট বাঁধে এবং নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। তারা ধানের গোলা তৈরি করে তাতে ধান জমা করে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু তারা তাদের প্রতিকূল অবস্থার কথাও ভোলে না, তারা বুঝতে পারে যে শুধু ফসল ফলালেই সমস্যার সমাধান হবে না বরং একসঙ্গে থেকেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

গণনাট্য আন্দোলনে লোকজ মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিপ্লব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গণনাট্য সংঘ সমকালীন নাট্য আন্দোলনে এই জাতীয় নাটককেই সাদরে গ্রহণ করেছিল। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকটির মাধ্যমে গণনাট্য আন্দোলন কে যেমন জোরদার করেছিলেন তেমনি নিরন্ন, নির্যাতিত, নিপীড়িত কৃষক সমাজের মুক্তির পথটিও দেখিয়েছেন। চন্দন খাঁ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> "আমাদের দেশের অসংগঠিত কৃষক সমাজ সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে বিপ্লবের সামিল হলে একদিন স্বপ্নের ভোর আসবেই। কমিউনিস্ট বিজন বাবুও এই স্বপ্ন পথের অভিযাত্রী ছিলেন। তার এই স্বপ্ন কিন্তু রোমান্টিক কল্পনা বিলাস নয়, এ স্বপ্নের মধ্যে মিশে আছে ঘাম, অশ্রু, আর রক্তের নোনতা স্বাদ। কোন পথে কৃষক মুক্তি সম্ভব, নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই দিক চিহ্নটি আলোচনা নাটকে তুলে ধরেছেন।"[১৪]

বিজন ভট্টাচার্য সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত নানাশ্রেণীর মানুষের জীবন সংগ্রামের করুন চিত্র তার বেশ কয়েকটি নাটকেই তুলে ধরেছেন। গণনাট্য আন্দোলন মূলত গণের আন্দোলন অর্থাৎ জনগণের একত্রিত হয়ে লড়ার আন্দোলন, এখানেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভাবধরার কোন স্থান নেই। সমবেত হওয়ায় এখানকার মূল সুর। পরবর্তীকালে মতাদর্শগত কারণে নাট্যকার এই গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু তিনি পুরোপুরি এই আবহের বাইরে যেতে পারেননি এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার বলেছেন- "যাঁরা নাটক দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য নানা কারণে গণনাট্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাঁর নাটকে গণনাট্যের মূল লক্ষ্য অধিকাংশত বজায় ছিল।"[১৫] গণনাট্যের প্রচলিত ধারণায় এই গণ কথাটি বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। গণনাট্যে জনগণের আশা - আকাঙ্ক্ষা, সুখ- দুঃখ, আনন্দ -বেদনা এবং সর্বোপরি তার সংগ্রাম উপজীব্য হয়ে দেখা দেয়। তাই একসময় জননাট্য কথাটি চালু ছিল। শুধুমাত্র জনগণের সুখ ও দুঃখের লড়াই নয় তাদের সামগ্রিক জীবনকে দেখা ও তাদের প্রয়াসগুলোকে মার্কবাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং দেখানোটাই ছিল গণনাট্যের মূল উদ্দেশ্য।

তথ্যসূত্র:

১) চৌধুরী, দর্শন, 'গণনাট্য আন্দোলন', দ্বিতীয় প্রকাশ, অনুষ্ঠিত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ১।
২) রায়, মন্দিরা, 'গণনাট্য এবং নবনাট্য: একটি বিতর্ক', বামা পুস্তকলয়, কলকাতা, ২০০৪ পৃষ্ঠা ৪।
৩) চৌধুরী, দর্শন, 'গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩৩।
৪) চৌধুরী, দর্শন, 'গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন', বামা পুস্তকলায়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১০৬।

৫) ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি ., কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৪।

৬) নবারুণ, ভট্টাচার্য ও শমিক, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ', দেজ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৫৪।

৭) দর্শন, চৌধুরী, 'গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৯৪, পৃ, ১৮৪।

৮) নবারুণ, ভট্টাচার্য ও শমিক, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৫ জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৯।

৯) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬।

১০) নবারুণ, ভট্টাচার্য ও শমিক, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৫।

১১) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮।

১২) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮।

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭।

১৪) খাঁ, চন্দন, 'দেবীগর্জন : পুনর্মূল্যায়ন', ঘোষ এন্ড কোং, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩৮।

১৫) সরকার, পবিত্র, 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ', প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৯।